বাংলা সাহিত্যে একুশ

রফিক হাসান

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উপর বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনের প্রভাব ব্যাপক। ভাষা আন্দোলনের পরে বাংলা সাহিত্যের মূল চেতনায় ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেয়। বায়ান্নোর আগের বাংলা সাহিত্য ও বায়ান্নোর পরের বাংলা সাহিত্যের মধ্যে পার্থক্যটা বেশ সুস্পষ্ট।

এর প্রধান কারণ সম্ভবত এ অঞ্চলের মানুষ ও কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে নিজ দেশ, মাটি, মানুষ ও ভাষার ব্যাপারে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি। ভাষা আন্দোলনের ফলে বাঙালি জাতির মধ্যে দেখা দেয় নবজাগরণ। আর এরই প্রতিফলন দেখি আমাদের কবিতা, গল্প, নাটক, উপন্যাস ও অন্যান্য সাহিত্যমাধ্যমে। এর আগে এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে নিজ ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি এতটা মায়া, মমতা ও আন্তরিকতা দেখা যায়নি। বিশেষ করে বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বাংলা ভাষার প্রতি উদাসীনতা বা তাচ্ছিল্য পরিলক্ষিত হয়েছে। তাদের মনে তখনও আরবি, ফার্সি ও উর্দু ভাষার প্রতি পক্ষপাতিত্ব ছিল।

বাংলা ভাষায় কথাবার্তা বললেও এই ভাষায় সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে তাদের মাঝে কিছুটা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল। সে কথাই প্রতিফলিত হয়েছে অষ্টাদশ শতকের কবি আব্দুল হাকিমের একটি কবিতায়। তিনি লেখেন: যেসবে বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী/ সেসব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি/ মাতা-পিতামহ ক্রমে বঙ্গেতে বসতি/ দেশী ভাষা উপদেশ মান হিত অতি/ দেশী ভাষা বিদ্যা ঘরে মনে না জুড়ায়/নিজ দেশ ত্যাগি কেন বিদেশে না যায়/

ভাষা আন্দোলনের একেবারে উষালগ্নে সবচেয়ে বড় অবদান রাখেন জ্ঞানতাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। তিনি ১৯৪৭ সালের ২ জুলাই পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা নামে একটি নিবন্ধ লেখেন। নিবন্ধটি প্রকাশিত হয় তখনকার সবচেয়ে জনপ্রিয় বাংলা দৈনিক আজাদে। ফলে তার আলোচনা সুধী সমাজে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে। বুদ্ধিজীবীদের একাংশ ভাষার দাবীতে আন্দোলন শুরু করার পক্ষে মত দেন এবং জনমত গঠন করার চেষ্টা করেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, 'আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য তার চেয়ে বেশী সত্য আমরা বাঙালী। এটি কোন আদর্শের কথা নয় এটি একটি বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালিত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে তা মালা তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি দাড়িতে ঢাকবার জো নেই।'

এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, 'একদল চাচ্ছে খাঁটি বাংলাকে বলি দিতে, আর একদল চাচ্ছে জবে করতে। একদিকে কামারের খাড়া আর একদিকে কসাইয়ের ছুরি।'

পল্লী কবি জসীম উদ্‌দীনের ভাষায়: আমার এমন মধুর বাংলা ভাষা/ মায়ের বোনের আদর মাখা/ মায়ের বুকের ভালোবাসা/ এই ভাষা রামধনু চড়ে/ সোনার স্বপন ছড়ায় ভবে/ যুগযুগান্ত পথটি ধরে/ নিত্য তাদের আসা যাওয়া/

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির মর্মান্তিক ঘটনার পরে প্রথম যে কবিতাটি রচিত হয় তার শিরোনাম ছিল, 'ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি'। লেখক মাহবুব-উল আলম চৌধুরী। এটি ২২ ফেব্রুয়ারি রচিত হয়। মাহবুব-উল আলম চৌধুরীর বাড়ি চট্টগ্রামে এবং তিনি ঢাকার ঘটনার বিবরণ শুনে পরের দিনই এই ঐতিহাসিক কবিতাটি রচনা করেন।

দীর্ঘ কবিতাটির প্রথম কয়েকটি লাইন এরকম: এখানে যারা প্রাণ দিয়েছে/ রমনার ঊর্ধ্বমুখী কৃষ্ণচূড়ার নীচে/ সেখানে আগুনের ফুলকির মতো/ এখানে ওখানে জ্বলছে রক্তের আলপনা/ সেখানে আমি কাঁদতে আসিনি/ আজ আমি শোকে বিহ্বল নই/ আজ আমি ক্রোধে উন্মত্ত নই/ আজ আমি রক্তের গৌরবে অভিষিক্ত/ যারা আমার অসংখ্য ভাইবোনকে হত্যা করেছে/ যারা আমার হাজার বছরের ঐতিহ্যময় ভাষায় অভ্যস্ত/ মাতৃ সম্বোধনকে কেড়ে নিতে গিয়ে/ আমার এইসব ভাইবোনদের হত্যা করেছে/ আমি তাদের ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি/

পরের বছর ১৯৫৩ সালে একুশে ফেব্রুয়ারির প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে বের হয় একটি সংকলন যা কি না একুশে ফেব্রুয়ারির প্রথম সংকলন হিসেবে বিখ্যাত। ঐতিহাসিক এই সংকলনটি সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন কবি হাসান হাফিজুর রহমান।

সেখানে একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা শহীদদের কথা স্মরণ করে অনেকগুলো কবিতা ছাপা হয়। যেমন হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতাটির শিরোনাম ছিল 'এবার আমরা তোমার'। আম্মা তাঁর নামটি

ধরে একবারও ডাকবে না তবে আর?/ ঘূর্ণিঝড়ের মতো সেই নাম উত্থাপিত মনের প্রান্তরে/ ঘুরে ঘুরে জাগবে, ডাকবে/ দুটি ঠোঁটের ভেতর থেকে মুক্তোর মতো গড়িয়ে এসে/ একবারও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে না সারাটি জীবনেও না?/ কি করে এই গুরুভার সইবে তুমি, কতদিন?/ আবুল বরকত নেই সেই অস্বাভাবিক বেড়ে ওঠা/ বিশাল শরীর বালক, মধুর স্টলের ছাদ ছুঁয়ে হাটতে যে তাকে ডেকো না/ যাদের হারালাম তারা আমাদেরকে বিস্তৃত করে দিয়ে গেল/ দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে কণা কণা করে ছড়িয়ে দিয়ে গেল/ দেশের প্রাণের দীপ্তির ভেতর মৃত্যু অন্ধকারে ডুবে যেতে যেতে/ আবুল বরকত, সালাম, রফিকউদ্দিন, জব্বার/ কি আশ্চর্য, কি বিষণ্ন নাম! একসার জ্বলন্ত নাম/

চল্লিশ দশকের প্রখ্যাত কবি ফররুখ আহমদ লেখেন: যাদের বুকের রক্তে মাতৃভাষা পেয়েছে সম্মান/ সঙ্গিনের মুখে যারা দাঁড়ায়েছে নিষ্কম্প, অম্লান/মানে নাই কোন বাধা, মৃত্যুভয় মানে নাই যারা/ তাদের স্মরণচিত্র এ মিনার-কালের পাহারা/

চল্লিশের আর এক কবি আহসান হাবীবও একুশকে নিয়ে কবিতা না লিখে থাকতে পারেননি। তার কবিতার শিরোনামও একুশ। তুমি সন্ধ্যার সিন্ধুপাখির/ ঘরে ফিরে আসা ভঙ্গি/ তুমি সারারাত উদ্দীপনার উদ্দামতার সঙ্গী/ উৎসব শেষে তুমি চলে গেলে দুই পারে দুই ফাল্গুন/ মাঝখানে তার ধূধূ প্রান্তর ছাই হয়ে ওড়ে এ আগুন/

পঞ্চাশের অন্যতম প্রধান কবি শামসুর রাহমানও থেমে থাকেননি। একুশে ফেব্রুয়ারিকে স্মরণ করে তিনি লেখেন 'তোমরা নিশ্চিহ্ন করে দাও' কবিতাটি। তোমরা নিশ্চিহ্ন করে দাও আমার অস্তিত্ব/ পৃথিবী হতে চিরদিনের জন্যে নিশ্চিহ্ন করে দাও/ উত্তরাকাশের তারার মতো আমার ভাস্কর অস্তিত্ব/ নিশ্চিহ্ন করে দাও, নিশ্চিহ্ন করে দাও/

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ লেখেন: 'মাগো ওরা বলে' কুমড়ো ফুলে ফুলে/ নুয়ে পড়েছে লতাটা/ সজনে ডাঁটায়/ ভরে গেছে গাছটা/ আর, আমি ডালের বড়ি/ শুকিয়ে রেখেছি/ খোকা তুই কবে আসবি/ কবে ছুটি? চিঠিটা তার পকেটে ছিল/ ছেঁড়া আর রক্তে ভেজা/ কুমড়ো ফুল/ শুকিয়ে গেছে/ ঝরে পড়েছে ডাঁটা/ পুঁই লতাটা নেতানো/ খোকা এলি?/ ঝাপসা চোখে মা তাকায়/ উঠোনে উঠোনে/ যেখানে খোকার শব/ শকুনিরা ব্যবচ্ছেদ করে/

ভাষা আন্দোলনের সেই সূচনালগ্নে ফজলে লোহানী এক কবিতায় জনগণকে জেগে ওঠার আহ্বান জানান এভাবে: আর চুপ নয়/ মায়েরা সব গেয়ে ওঠো আজ/ ধান ভানতে ক্ষুদ কুড়োতে/ গমের শীষের খোসা ছড়াতে/ মায়েরা সব গেয়ে ওঠো- আর চুপ নয় এবার শুধু/ শহীদের গান। বিজয়ের গান/ শহরে যাদের মৃত্যু হয়েছে/ ফিরে আসছে / ফিরে আসছে/ হাজারে হাজারে মিছিল করে/

পঞ্চাশের আর এক কবি আলাউদ্দিন আল অজাদ লেখেন 'স্মৃতির মিনার' নামক একটি ঐতিহাসিক কবিতা যেটি প্রথম ছাপা হয়েছিল হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত একুশে ফেব্রুয়ারি নিয়ে প্রকাশিত প্রথম সংকলনে।

স্মৃতির মিনার ভেঙেছে তোমার? ভয় কি বন্ধু? আমরা এখনো/ চারকোটি পরিবার/ খাড়া রয়েছি তো! যে ভিত কখনো কোন রাজন্য পরেনি ভাঙতে/ ইটের মিনার ভেঙেছে ভাঙুক। ভয় কি বন্ধু, দেখ এবার আমরা জাগরী/ চারকোটি পরিবার/

হাসান হাফিজুর রহমানের সেই একুশে সংকলনের পরে বাংলা ভাষাকে নিয়ে এবং ফেব্রুয়ারির সেই মর্মান্তিক ঘটনাকে স্মরণ করে পত্রপত্রিকা ও সংকলন বের করার জোয়ার আসে। প্রতি বছরই বের হয় অসংখ্য সাহিত্য সংকলন। কবি ও সাহিত্যিকেরা দু'হাতে লিখতে থাকেন কবিতা, ছড়া, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নিবন্ধ।

একথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে বাংলা ভাষায় বিশেষ করে বাংলাদেশে এমন কোনো বিখ্যাত কবি নেই যিনি একুশে ফেব্রুয়ারিকে নিয়ে কোনো কবিতা, ছড়া বা প্রবন্ধ নিবন্ধ লেখেননি। প্রায় সব কবির কলমেই লেখা হয়েছে। পঞ্চাশের দশক থেকে শুরু করে আজ অব্দি সে ধারা অব্যাহত রয়েছে। এখনও প্রতি বছর অসংখ্য কবিতা, ছড়া, গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ নিবন্ধ লেখা হচ্ছে।

একুশে ফেব্রুয়ারিকে উজ্জীবিত করে যে কবিতাটি সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছে সেটি আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী লিখিত একুশে ফেব্রুয়ারি কবিতা। যেটি গান হয়ে একুশে ফেব্রুয়ারির প্রতীকী সংগীতে রুপান্তরিত হয়েছে। আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি/ আমি কি ভুলিতে পারি/ ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু-গড়া এ ফেব্রুয়ারি/ আমি কি ভুলিতে পারি/ আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙানো ফেব্রুয়ারি/ আমি কি ভুলিতে পারি/

কবিতার এ কটি চরণ উচ্চারণ ছাড়া একুশে ফেব্রুয়ারি কোনো অনুষ্ঠানই পরিপূর্ণ হয় না। রেডিও টেলিভিশনে এবং একুশে ফেব্রুয়ারির রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানেও গানটি অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথে গাওয়া হয়। এই গানটি গেয়ে একুশের সকালে বের হয় প্রভাত ফেরি।

একুশে ফেব্রুয়ারির মর্মান্তিক ঘটনার পরে যে গানটি মানুষকে উজ্জীবিত করার জন্য মাঠে ময়দানে গাওয়া হতো সেটি হচ্ছে আব্দুল লতিফের লেখা ও সুর করা এই গানটি। ওরা আমার মুখের কথা কাইড়া নিতে চায়/ ওরা, কথায় কথায় শিকল পরায় আমার হাতে পায়/ কইতো যাহা আমার দাদায়/ কইছে তাহা আমার বাবায়/ এখন কও দেখি ভাই মোর মুখে কি অন্য ভাষা শোভা পায়/

ফজল-এ-খোদা লিখিত আর একটি গান মানুষের হৃদয় জয় করে নেয়। গানটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই গানের মধ্যে ফুটে উঠেছে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের একান্ত আবেগ আর অনুভূতি। বীর মুক্তিযোদ্ধারা এই গান গাইতে গাইতে জীবন বাজি রেখে শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে: সালাম সালাম হাজার সালাম/ সকল শহীদ স্মরণে/ আমার হৃদয় রেখে যেতে চাই/ তাদের স্মৃতি চরণে/ মায়ের ভাষায় কথা বলাতে/ স্বাধীন আশার পথ চলাতে/ হাসিমুখে যারা দিয়ে গেলপ্রাণ/ সেই স্মৃতি নিয়ে গেয়ে যাই গান/ তাদের বিজয় মরণে/

এই ক্ষুদ্র পরিসরে বাংলা ভাষায় একুশের উপস্থিতির বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে ষাট, সত্তর ও আশির দশকের কবিদের কবিতা থেকে আরো কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

আবু হেনা মোস্তফা কামাল লেখেন: আজ আমি কোথাও যাবো না। আমি কিছুই করবো না আজ/ সূর্যের পিয়ন এসে দরজায় যতো খুশি কড়া নেড়ে যাক, স্নান ঘরে/ অবিরল ঝরুক শাওয়ার, ভেসে

যাক প্রভাত ফেরির গান/ ক্যাম্পাসের সমস্ত আকাশে সুগম্ভীর শহীদ মিনারে/ ছাত্রদের প্রগাঢ় অঞ্জলি থেকে পড়ুক অজস্র ফুল, মেয়েদের সুললিত হাতে/ লেখা হোক নতুন আলপনা, পৃথিবীর সমস্ত বেতার কেন্দ্র থেকে/ উৎসারিত হোক রবী ঠাকুরের গান, আমি তবু/ কোথাও যাবো না আজ আমার নিজস্ব জন্মদিনে/

আল মাহমুদের ভাষায়: আমিও অন্তরঙ্গ হয়ে যাই হঠাৎ তখন/ জনতার সমুদ্রের সাথে/ বাঘের হাতের মতো সনখ শপথ/ সোহাগের গাঢ় ইচ্ছা নিয়ে নেমে আসে মনের ওপর!/ নির্মম আদর পেয়ে আমিও রক্তাক্ত হবো/ বরকতের শরীরের মতো?/

কবি আল মুজাহিদী বংলা বর্ণমালার গৌরব গাথেন এভাবে: গোলাপ স্তবক/ ও আমার সার্বভৌম বর্ণমালা/ তোমাদের স্বাধীন আত্মার ভেতর/ আমি আয়ুষ্মান/ আমার স্বদেশ/ নির্মিতির স্বদেশ/ ও আমার সার্বভৌম বাংলা বর্ণমালা/

ষাটের আর এক কবি আসাদ চৌধুরী। তিনি বলেন: ফাগুন এলেই একটি পাখি ডাকে/ থেকে থেকেই ডাকে/ তাকে তোমরা কোকিল বলবে? বলো/ আমি যে তার নাম রেখেছি আশা/ নাম দিয়েছি ভাষা/ কত নামেই তাকে ডাকি/ মেটে না পিপাসা/

ইমরান নুরের কবিতায় আরো পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠেছে একুশের চেতনা। তিনি বলেন: একুশ আমার চেতনা/ একুশ আমার স্বপ্ন/ একুশ আমার অস্তিত্ব/ একুশ আমার উপলব্ধি/ একুশ আমার শক্তি/ একুশ আমার সাহস/একুশ আমার উদ্দীপনা/ একুশ আমার উচ্ছাস/

আব্দুল মান্নান সৈয়দের কবিতার নাম একুশে ফেব্রুয়ারি-অজস্র দিনের মধ্যে জ্বলেছে একুশে ফেব্রুয়ারি/ সালাম বরকত শফি জব্বার.../ আত্মায় আহত হয়ে তুলেছে উদ্দীপ্ত তরবারি/ সালাম বরকত শফি রফিক জব্বার.../ আমাদের আকাশের নব নব নক্ষত্র সম্ভার/ সালাম বরকত শফি রফিক জব্বার/

ষাটের আর এক বিপ্লবী কবি নির্মলেন্দু গুণ। তার ভাষায়: যেহেতু নির্মিত কুশে, তার নাম রাখা হলো কুশ/ না আমি নির্মিত নই বাল্মীকির কাল্পনিক কুশে/ আমাকে জন্ম দিয়েছে রক্তঝরা অমর একুশে/

সিকদার আমিনুল হক লেখেন: বালক আমি জানতাম না কার ক্ষত থেকে/ এত রক্ত ঝরছে/ কে বরকত আর কে সালাম আর কার নামই বা রফিক?/ শুধু দেখতাম ঝোড়ো হাওয়ার মতো বিক্ষুব্ধ মানুষ/ যাচ্ছে রাস্তায়, মাঠে আর গনগনে মিছিল/ বালক বলেই বুঝিনি/ জানতাম না ঘাতক ও শহীদের দূরত্ব/

এই ঘাস এই মাটির বুকে আস্তে করে পা রেখো/ এখানে আমার ভাই বরকত, সালাম, আসাদেরা শুয়ে আছে/ ওরা ব্যাথা পাবে, ডুকরে কেঁদে উঠবে/ এই নরম মাটিতে আস্তে করে পা ফেলো/ আমার ভাইয়ের রক্তে এ বাংলা এখনো ভেজা, স্যাঁতসেঁতে এ মাটি রাতদিন কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করে বিধাতার কাছে/ আমার মায়ের ভাষা, মুখ থেকে/ কেড়ে নিতে দেবো না দেবো না/ এটি সত্তর দশকের আলোচিত কবি দাউদ হায়দারের একুশ নামক কবিতার কয়েকটি পঙতি।

দশকে দশকে কবিতার ভাষা ও ভঙ্গিতে কিছুটা পরিবর্তন দেখা দেয়। আর্থ সামাজিক প্রেক্ষপট পরিবর্তনের কারণে এটাই স্বাভাবিক। যেমন আশির দশকের তরুণ কবি দারা মাহমুদ বাংলা ভাষার উপর হিন্দির আগ্রাসনের বিষয়টি তুলে ধরেছেন এভাবে: শিশুটিকে জিজ্ঞেস করতেই/ কচিমুখে বলে উঠল, তবিয়ত খারপ হ্যায়/ সারাদিন হিন্দি কার্টুন চ্যানেলে/ চরম আসক্ত এই গৃহপালিত শিশুটির/ মা বাবাও বলে ওঠে হিন্দি বচন.../ ভাষা আগ্রাসন/ বাংলার গলা চেপে ধরেছে/ এখন জীবনের অন্য নাম সিরিয়াল/ হিন্দি সিনেমা, শাহরুখ-ক্যাটরিনা/

আশির দশকের তরুণ কবি জাকির আবু জাফর বাংলা অক্ষরের মহিমা তুলে ধরেন এভাবে: পাতার শরীরে সাঁটা অক্ষরগুলোর গায়ে জড়ানো/ আমার বাংলা ভাষার আশ্চর্য সৌরভ/ ফুলের হৃদয়ে লেখা চিঠি সেও আমার বাংলার আনন্দে দুলছে/

একুশকে নিয়ে লেখা হয়েছে অসংখ্য ছড়া। আবু সালেহ একুশের ছড়ায় লেখেন: যে ভাষাটি জীবন দিয়ে রক্ষা পেলো/ সেই ভাষাটি বর্তমানে কোথায় এলো/ না আছে তার আবেগময়ী শব্দগুলো/ সেই ভাষাটি হয় গুড়িয়ে পথের ধুলো/

সুকুমার বড়ুয়া: মনের ভাষা মুখের ভাষা/ সকল প্রাণীর জানা/ মাতৃভাষার সাধ মেটাতে/ কেউ করে না মানা/

লুৎফর রহমান রিটন লেখেন: বায়ান্নোতে উত্তাল সেই দিনে/ পিচঢালা পথে ফুল হয়ে ফুটলাম/ মাতৃসম এ বাংলা ভাষার ঋণে/ জীবন দিয়েছি, অমরতা পেলো নাম/ এই আমাদের রক্তের বিনিময়ে/ তোমরা পেয়েছো সোনার বর্ণমালা/ চার দশকের দীর্ঘ সময় পরে/ আজ তোমাদের কৈফিয়তের পালা/

আগুন লাগা ফাগুন এলো কৃষ্ণচুড়া বনে/ বাংলা ভাষার কাঁপন জাগে লক্ষ হাজার মনে/ বাংলা আমার মায়ের ভাষা বাংলা আমার গান/ বাংলা কথায় পরান জুড়ায় মন করে আনচান/ এটি কবি রফিক হাসানের একটি ছড়ার শুরু। শেষে তিনি বলেন: রক্তে জাগে বর্ণমালার পাগল করা ঢেউ/ বাংলা ছাড়া অন্য ভাষার দাম দিও না কেউ/

ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই পরবর্তীতে এতদাঞ্চলে সংঘটিত হয় অসংখ্য আন্দোলন সংগ্রামের। তার ধারাবাহিকতায় সংঘটিত হয় মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম আর রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ। পাকিস্তানি স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠে এদেশের আপামর জনতা। সে সব আন্দোলন সংগ্রাম প্রতিফলিত হয় পত্রপত্রিকার সাহিত্য পাতায়। অসংখ্য বইও প্রকাশিত হয় বাংলা ভাষার সন্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে।

ভাষা আন্দোলন নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা করে বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন বামপন্থী বুদ্ধিজীবী বদরউদ্দিন ওমর। তিনি বিশদভাবে তুলে ধরেছেন একুশের ঘটনার কী প্রভাব পড়েছে দেশের সাহিত্য সংস্কৃতি, রাজনীতি আর আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে।

বাংলা আজ আর্ন্তজাতিকভাবেও পরিচিত। আন্তর্জাতিকভাবে বাংলা ভাষার প্রথম পরিচয় ঘটে ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল পুরস্কার পাওয়ার মাধ্যমে। তারপর দীর্ঘদিন আর্ন্তজাতিক অঙ্গনে বাংলা ভাষার তেমন কোনো উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়নি। কিন্তু একুশে ফেব্রুয়ারির এবং একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের আবির্ভাবের পরে সারা বিশ্বে বাংলা ভাষা যথেষ্ট পরিচিতি লাভ করে। একুশে ফেব্রুয়ারির সেই ঘটনার স্বীকৃতি স্বরূপ জাতিসংঘ এই দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করে থাকে। ফলে সারা বিশ্বের শিক্ষিত সমাজ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপারে কমবেশি অবহিত।